দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ লোকসংস্কৃতি

জীবজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতির দৌলতেই মানুষ ভূ - মন্ডলের অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃত পক্ষে এই সংস্কৃতিই মানুষকে বিবর্তনের পথ দেখিয়ে সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে উত্তরণ ঘটায়। আবার এই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ও লোক সংস্কৃতির প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদিকথা ও লোকসংস্কৃতির চর্চাকেই বলেছিলেন"জ্ঞানের আদিনিকেতন চর্চা"। সময়ের বিবর্তনে বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ অঞ্চলের বা স্থানের সভ্যতা ও কৃষ্টির ঐতিহ্য। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এই জেলায় সাংস্কৃতিকঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর,স্বতন্ত্রধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অবিভক্ত বাংলার যে ভূ - খন্ড গঙ্গানদীর উত্তর প্রান্তে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সেই ভূ - খন্ডই যেমন উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, তেমনি এই উত্তরবঙ্গের আসাম সীমান্তবর্ত্তী এক প্রত্যন্ত জেলা এই কোচবিহার। কৃষি নির্ভর সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল উত্তরবঙ্গে-র এই জেলা। কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ শুধু তাই কোচবিহারের ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বলাবাহুল্য আজকের কোচবিহারের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য চিরদিন বর্তমান রূপে ছিলনা । অনন্ত কাল ধরে নতুন নতুন জাতি (Race),জনজাতি ও গোষ্ঠীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে এতদ্ঞ্চলে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে একাধিক সময়ে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমান কোচবিহার তার নির্দিষ্ট কোনও একটিকে স্মরণ করেনি। "খ্রীষ্টীয় দশম শতকে কম্বোজাক্ষ নামে এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত এক স্তম্ভলিপিতে এবং ইরদা তাম্র লিপিতে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পন্ডিতরা মনে করেন যে এই কম্বোজরা হিমালয়ের মানুষদের কোন মোঙ্গলীয় জনের শাখা। পরবর্তী কালে আগত বর্তমান কোচবিহারে কোচ, পালিয়া, রাজবংশীদের সাথে এদের দেহ বৈশিষ্ট্য ও ভাষাগত সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ,মেচ প্রভৃতি উপজাতি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করেন। এরা বৃহত্তর বেহরা জাতির বিভিন্ন শাখা।" [১]

প্রাচীন কামতাপুর তথা বর্তমান কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতহ্য বিচার করলে আমরা দেখতে পাই কোচবিহার ছিল একদিন সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান। বিচিত্র সংস্কৃতির মিশ্রণে কোচবিহার হয়ে উঠেছিল ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক মিলনতীর্থ। ১৯৫০ সালে কোচবিহার তার রাজন্য পোষাক পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়।

কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে রয়েছে নিম্ন আসাম ও বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর, দিনাজপুর ও নেপালের মরং অঞ্চলের স্মৃতি চিহ্ন। স্বভাবতই এই বৃহৎ অঞ্চলের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ছিল এই জেলার সংস্কৃতির ভান্ডার। এই অঞ্চলের বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি নীড় স্থাপিত হয়েছিল । বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের মতে তিন হাজার বছর পূর্বেও এই অঞ্চলে ছিল সমৃদ্ধ জনবসতি। আর তখন বাংলার দক্ষিণ অংশটি ছিল সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত। বাংলার লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ প্রাচীন মৌখিক সাহিত্য ময়নামতীর গান, গোরক্ষনাথের গান এই অঞ্চলেরই দান। চর্যাপদের ভিত্তিভূমিও ছিল এই ভূ- খন্ড । এছাড়াও বাংলা গদ্যের নিদর্শনও মিলেছে এখানে " ১৫৫৫অহমরাজ চুকুমফাকে লেখা মহারাজ নরনারায়ণের চিঠিতে"[২]

স্বাভাবিক ভাবেই কোচবিহার ছিল তার অতীত গৌরব নিয়ে এমন একটি জনপদ যে অঞ্চলের মৌখিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল যেমন প্রাচীন তেমনি স্বতন্ত্র।

রাজদরবারে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় ও সৌজন্যে এতদ্ঞ্চলের কবিগণ কাব্য রচনা করলেও অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের স্বতন্ত্রধর্মী নিরপেক্ষ ব্যক্তিমনের ছাপ ছিল স্পষ্ট। "প্রাচীন কোচবিহারে সাহিত্য চর্চার প্রতি অনুরাগ যে কত প্রবল ছিল তা কোচবিহারের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়। কোচবিহারের রাজারা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ভূমি ও অর্থ

সাহায্য করেছেন। ঘনরাম, কবিকঙ্কন, রামেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের কবিদের যে সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া যায় তার মধ্যে কিরাত পর্ব পুস্তকটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।"[৩]

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে মহারাজা প্রাণ নারায়ণের রাজ সভার অন্যতম বিদগ্ধ কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের অনুবাদ কোচবিহারের প্রাচীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । এছাড়াও তিনি অসংখ্য কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজবংশীয় দ্বিতীয় রাজা মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভায় একশরণ নাম ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ শংকর দেব কোচবিহার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। বাংলাভাষায় লিখিত আঞ্চলিক ইতিহাস 'রাজোপাখ্যান' ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়নাথ মুন্সী রচনা করেন।

প্রাচীন কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ধারাটি ছিল মূলত অনুবাদ সাহিত্যের ধারা। তৎকালীন কোচ রাজ্যে শিবের মাহাত্ম্য ছিল সর্বাধিক প্রচলিত। কোচবিহার তাই শৈব তীর্থ নামেও পরিচিত। মহারাজা বিশ্বসিংহ প্রথম হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন এই রাজ্যে। এতদ্‌ঞ্চলে রাভা, কোচ, মেচ,গারো জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রধান দেবদেবীগণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে শিবও গৌরীতে উন্নীত হয়েছেন।

মঙ্গল কাব্যের আঙ্গিকে এখানে রচিত হয়েছিল গোসানীমঙ্গল। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে গোসানীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কোচবিহার রাজসভায় কবি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচনা করেন 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য - যা এতদ্‌ঞ্চলের লোকায়ত কাহিনী নির্ভর সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন।

রাজন্য শাসিত কোচবিহারে ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত সাধনার চারশত বছর সময় কালের সারস্বত সাধনার সাহিত্য সম্ভারের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন প্রাচীন কোচবিহারের বিশাল পুঁথির সম্ভার। অমূল্য এই পুঁথির সম্ভার আজও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার সাহিত্য সভায় সযত্নে রক্ষিত আছে। কোচরাজত্বের অন্তিমলগ্নে (১৯৪৮) শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় (A descriptive catalogue of Bengali manuscripts) ১০২টি বাংলা ও ১৯ টি অসমিয়া পুঁথির সমৃদ্ধ তালিকা প্রকাশিত হয়। ডঃ দাশগুপ্ত সম্পাদিত পুঁথিগুলি দুটি শ্রেণীত বিন্যস্ত। যেমন - বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থের পান্ডুলিপি। কোচবিহারের সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই পুঁথি গুলির মূল্য আজও অপরিহার্য। মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে বিশিষ্ট সভাকবি ছিলেন মনকর, দুর্গবর, পীতাম্বর। পুরাণ অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্য সাধনার শুভ সূচনা হয়েছিল এখানে। এর দুর্লভ নিদর্শন ভাগবতের প্রথম ও দশম স্কন্দের অনুবাদ। বিশ্বসিংহের রাজসভায় পীতাম্বর প্রথম কবি যিনি প্রথম পুরাণ অনুবাদ করেন। মার্কন্ডেয় পুরাণের ভণিতায় তিনি বলেছেন—

"মহারাজা বিশ্বসিংহ কামতা নগরে
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে"
(পুঁথি নং-৮)[৪]

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্ব কালে রাজসভার মধ্যমণি ছিলেন শঙ্করদেব। ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে, "তৎকালীন কোচরাজ্যে শঙ্করদেবের সাহিত্য সাধনার সময়কাল ছিল ১৫৪৩ - ১৫৬৮ খ্রীষ্ট্রাব্দ।"[৫] তাঁর সাহিত্য কর্মের সুপ্রাচীন নিদর্শন গুলি পুঁথি আকারে আজও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম এবং একাদশ স্কন্দ শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের অনুদিত। রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সম্পদ এই পুঁথি গুলির মাধ্যমে কোচবিহারের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির মধ্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে লোক সাংস্কৃতির ঐতিহ্য। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে লৌকিক নানাধরণের জীবন চর্চার উপাদান। শিল্পে সমৃদ্ধ

জেলা গুলিতে লোকসংস্কৃতি এখন অতীতের মায়া। লোকজীবন পরিবর্তনশীল, কিন্তু বাংলার উত্তরাঞ্চলের এই জেলায় লোক সংস্কৃতি এখনও বহতা নদী। জীবন যাত্রার পরতে পরতে অমৃত ধারার মতই এখনও বর্ষিত হচ্ছে লোকসংস্কৃতির সঞ্জীবনী পুণ্যতোয়া স্পর্শ। লোকসংস্কৃতি এই অঞ্চলে আজও জনজীবনে, জন মনোরঞ্জনের প্রধান অঙ্গ অথবা বলা যায় অন্যতম নির্ধারক শক্তি।

কোন একটি নির্দিষ্ট জনপদ বা অঞ্চলের সুসংহত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে লোক মানসের সৃষ্টি হয় তাকে আমরা সামগ্রিক ভাবে বলতে পারি লোকস্তর। এই লোকস্তরেই উদ্ভব হয় যে সংস্কৃতির তাই হল লোকসংস্কৃতি। অর্থাৎ লোকস্তরই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব স্থল । তাই বলা যায় নিদিষ্ট কোন লোকায়ত জনগোষ্ঠীর লোকাচার, জীবন চর্চা, শিল্প, সাহিত্য ও ললিতকলা ইত্যাদির সামগ্রিক অভিব্যক্তি লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির প্রকাশ বা অভিব্যাক্তিকে একাধিক ভাগে ভাগ করা যায় যেমন— সংশ্লিষ্ট স্থানের লোকবিশ্বাস, লোকধর্ম,লোকাচার, লোকশিল্প, লোক উৎসব, লোক সংস্কার, লোক সাহিত্য ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত বিশেষ কোন লোক সমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় লোক সংস্কৃতির মধ্যে।

লোকসংস্কৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই লোক জীবনের লোকসংস্কৃতি গত দিকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। সংস্কৃতি বা কালচারের সঙ্গে 'ফোক' বা লোক যুক্ত হয়ে অর্থাৎ লোক জীবনের সংস্কৃতি চর্চা কল্পেই লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি।

সামগ্রিক ভবে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হলেও কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি অন্যান্য জেলা অপেক্ষা সতন্ত্রধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক মিশ্র জনগোষ্ঠী তাদের চলমান জীবনে গ্রহণ - বর্জন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কোচবিহারের জনজীবন অক্ষুন্ন রেখেছে তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতিকে। এক কথায় কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি হচ্ছে এতদ্‌ঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আত্মজীবনী।

"সংস্কৃতি হল মানুষের মনের সম্পদ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কাজেই সংস্কৃতি সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই ছবি স্থায়ী কিন্তু স্থির নয়, প্রবহমান। কারণ মানব জীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতিকে একার্থে স্থির চিত্র না বলে মানব জীবনের চলচ্চিত্রও বলা যেতে পারে। সেই সুদূরকালে, মানবসমাজের শৈশবে, কৈশোরে যে সংস্কৃতি ছিল, পল্লী জীবনের, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের - এককথায় লোকজীবনের পরিশীলিত যে রূপ তাকেই বলা হয় লোকসংস্কৃতি।" [৬]

সংস্কৃতি বা কালচার সম্পর্কে Oxford University Dictionary তে দেখা যায় Culture is the Intellectual side of civilization - এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে বলা যায় লোকসংস্কৃতি (Folk Culture) হল সাধারণ মানুষের সৃষ্ট পরিশীলিত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি।

মানবজীবনের রীতিনীতি, আচার - আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ ও যৌগিক সংমিশ্রণই হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতির আলোচনায় তাই সামাজিক মানুষের এক ছন্দময় রূপ ধরা পড়ে। জীবনের তালে তালে ও সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির রূপ রেখা বদলে যায়। আধুনিক, নতুন ও প্রাচীনের সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পথ ধরেই এগিয়ে চলে সংস্কৃতির প্রবাহ। সংস্কৃতির নানা ধারার একটি হল লোকসংস্কৃতি যা গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে সমুন্নত হয়েছে। এই লোকসংস্কৃতি হল বঙ্গ সংস্কৃতির মূল ভিত্তি।" [৭]

লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ ওয়াকিল আহমেদ মনে করেন, " বাংলার লোক সমাজ ও লোকসংস্কৃতির মূল উৎস ও ঐতিহ্য অনার্য জীবন ও তাদের জীবন যাত্রা প্রনালী। বাঙালী উপজাতির স্থিতিশীল সংস্কৃতি বাংলার আদিম সংস্কৃতি আর পল্লীবাসী বৃহত্তর জনগণের গতিশীল সংস্কৃতি বাংলার লোকসংস্কৃতি।" [৮]

"লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবন চর্যা ও মানস চর্চার সামগ্রিক কৃতি।" [৯]

সব দেশেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, এর একটিকে বলা যায় শিক্ষাগত নাগরিক ধারা অপরটি লৌকিক ধারা। এগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সমাজের সামগ্রিক জনসাধারণের সৃষ্টি। শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক সংস্কৃতির এটাই পার্থক্য।

কোন একটি অঞ্চল বা দেশের একটি জাতির আত্মজীবনী হল তার লোকসংস্কৃতি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতির প্রথা, দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আচার, বিশ্বাস, পূজা - পার্বণ, মেলা, উৎসব,অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারাবাহিকতার মধ্যেই একটি জাতির সঠিক পরিচয়পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য জেলা হল কোচবিহার। রাজ্যের অন্যান্য অনেক জেলার তুলনায় কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতি এখনও যেমন হৃদয়-স্পর্শী তেমনি প্রাণবন্ত।

বিচিত্র ভান্ডার নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান, ব্রতের গান, মন শিক্ষার গান, হেটো গান, বিয়ের গান, জারিগান , সবই এখনও সমান ভাবে আকর্ষণীয়। বাংলার অন্যত্র লোকনাটক প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কোথাও কোথাও লোকনাটক লোক অভিধাকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু কোচবিহারে প্রাচীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও অভিনীত হচ্ছে দোতরা, কুষান, বিষহরা প্রভৃতি লোকনাটক। বিচিত্র লোকধর্ম নিয়ে গড়ে উঠেছে কোচবিহারের জনজীবন। লৌকিক দেব - দেবীর আসন পাতা আছে এখনও। বিচিত্র লোক উৎসব, মেলা, নদীভিত্তিক উৎসব ও মেলা কোচবিহারের জনজীবনকে ধরে রেখেছে চিরায়ত বিশ্বাসে। লোকভাষায় রচিত লোকমন্ত্র গ্রামাঞ্চলে এখনও সরল বিশ্বাসে গৃহীত। লোক সংস্কৃতি ধরে রেখেছে কোচবিহারের জনজীবনকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রবাদ প্রবচন, ছিলকা, লোককথা, লোকপুরাণ কি নেই কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিতে। এখানে শিব, শীতলা, ও চন্ডী ঠাকুরের সঙ্গে পূজিত হন একই মর্যাদায় হুদুম, যাইটল, মাসান প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী। এখানকার কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় আবার শিব হয়েছেন কৃষির দেবতা। লোকক্রীড়া এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি এই জেলায়। এই তালিকায় আছে হা - ডু - ডু থেকে দারিয়াবান্ধা, ডাংগুটি,গোল্লাছুট, আংটি খেলা, সই পাতানো খেলা, জলকুমীর খেলা আরও কত কী।

লোক শিল্পের অঙ্গনটিও কোন ক্রমে ম্লান নয়। শোলার, মাটির, পাটের, কাঠের, বাঁশের আরও নানা উপাদানের বিচিত্র শিল্প জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন এই জেলার লোকশিল্পীরা। প্রকৃত পক্ষে কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির ভান্ডার বিশাল ও ব্যাপক।

উত্তবঙ্গের এই জেলার নারী সমাজের ঐতিহ্য লালিত যাইটল, কাতি, হুদুম, সুবচনী, কাত্যায়নী ব্রত কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, বর্ণময় ও উজ্জ্বল। উক্ত ব্রতগুলি ধর্মীয় পরিমন্ডলে অনুষ্ঠিত হলেও স্ত্রী - সমাজে লোকশিক্ষা প্রচারে আজও এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সমগ্র কোচবিহারের হাটে,মাঠে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নির্জন প্রান্তরে, নদী নালার ধারে খেটে খাওয়া অসংখ্য শ্রমজীবী নিরক্ষর ও নবসাক্ষর মানুষের গ্রাম্য কথাবার্তায় এমন অনেক প্রবাদ - প্রবচন, লোক কথা আত্মগোপন করে আছে যা কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত করে তুলছে সমৃদ্ধশালী। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি আজও জনজীবনে সুদূর প্রসারী। উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্যের প্রধান আঙ্গিক লোক নাটক - কুষান ও দোতরা পালা, মনসা - বিষহরি পালা যা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতদ্‌ঞ্চলে লোক ভাষা, লোক বিশ্বাস, লোক মানসিকতা আজও বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল, একই প্রাণধারায় পুষ্ট হয়েও বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিব্যক্তি। লোক কবির মারফতী গানের ভাষায় যাকে বলা যায়—

'নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'

যুগের পরিবর্তনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই মহাকালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা। প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্র সভ্যতার কৃত্রিম মূলবোধ - ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছে কোচবিহারের লোকজীবনের নতুন প্রজন্মকে। যে সহজ সরল জীবন যাত্রায় একদিন স্থানীয় সমাজ ছিল অভ্যস্ত, তারা এখন আধুনিক সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে

যেতে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের যত্নে লালিত ঐতিহ্য - সংস্কৃতি সহজে মুছেযাবার নয়। আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় এই লোকসংস্কৃতির চরণ - চিহ্ন আমরা অনুসরণ করবো পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে।

তথ্য সূত্র

১। উত্তবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার — অজিত কুমার দণ্ড (উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন, সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা চক্র উপলক্ষ্যে প্রকাশিতপুস্তিকা, তাং- ২৭ - ২৮ শে জুন, ১৯৯৮, দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি)

২। কোচবিহারের ইতিহাস — খান চৌধুরী আমানতুল্লা, প্রথম খন্ড, পৃ- ১০৪। কোচবিহার স্টেট, (১৯৩৬)

৩। উত্তবঙ্গের লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি — সুশীল কুমার ভট্টাচার্য - পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি / তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ — প.ব.স.,পৃ- ৮৫ (১৯৭০)

৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ — পীতাম্বর - A descriptive catalogue of Bengali manuscripts preserved in the state library of Cooch Behar, pub.by the Cooch Behar State - P - 8. (1948)

৫। Sankardev & His Times - Dr. Maheswar Neog, P - 161 (1965)

৬। উত্তরবাঙ্গলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি — উপেন্দ্র নাথ বর্মন, পৃ - ২৫৮ (১৩৯২) (১৯৭৬ সালের ২৮ ও২৯ শে মে জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতি পর্ষদের' প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদ সভাপতি ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রদত্ত ভাষণ।)

৭। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম — শংকর সেনগুপ্ত, (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি), পৃ - ৪২, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, (১৯৭০)

৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি — ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৩৯ বাংলা একাডেমি, ঢাকা (১৯৭৪)

৯। লোকসংস্কৃতি — তুষার চট্টপাধ্যায়, ভারত কোষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ - ৪৬৪, সম্পাদনা - ভারত কোষ পরিচালনা সমিতি, (১৯৭৩)